PRANTIK GABESHANA PATRIKA
MULTIDISCIPLINARY-MULTILINGUAL-PEER REVIEWED-REFERRED-BI-ANNUAL DIGITAL RESEARCH JOURNAL
Website: SANTINIKETANSAHITYAPATH.ORG.IN
VOLUME-1 ISSUE-1 JULY 2022

একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি

ড. সুব্রতকুমার পাল

LINK: https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2022/12/৫-বাংলা-কবিতা-সুব্রতকুমার-পাল-original-2-1.pdf

সারসংক্ষেপ: সমকালীনতা একালের কবিতার বৈশিষ্ট্য। বর্তমান মুহূর্তের ছবি বড়ো বেশি করে দেখা যায় এখনকার কবিতায়। সেই ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা না-করলে কবি এবং কবিতা অবরুদ্ধ হয়ে থাকবেন আপন বৃত্তে যা বাংলা কবিতার অগ্রগতির পক্ষে অশনিসংকেত।

সূচক শব্দ: বাংলা কবিতা, কবি, একবিংশ শতক, বাঙালি, অন্ত্যমিল, যতি, সমকালীন, করোনা, কোয়ারেন্টাইন, জীবন, জগৎ, পঙ্‌ক্তি, দেশ, চেতন, মনন, একাকীত্ব, ছন্দ ইত্যাদি।

১

বাংলা কবিতার একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গতিপ্রকৃতির আলোচনাকালে আমাদের অবশ্যই ফিরে তাকাতে হবে ফেলে আসা বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের দিকে। কারণ বাংলা সাহিত্যের যতগুলি ধারা কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিবর্তিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ধারা হলো বাংলা কবিতা। উপন্যাস ছোটগল্প নাটক প্রহসন প্রবন্ধ যুগচেতনায় যতখানি প্রভাবিত হয়েছে, সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে বাংলা কবিতার দেহে ও মনে। বাঙালি সবার আগে কবি। তারপর সে প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার কিংবা অন্য কিছু। বাঙালির চেতন এবং মনন যা সময় এবং কাল চেতনার দ্বারা যুগ যুগান্তরে প্রভাবিত, পরিবর্তিত হয়েছে। সেই চেতন মনের উৎকৃষ্টতম ফসল হলো বাংলা কবিতা। কবি কবিতা লেখার সময় দু'রকম ভাবনা-ভাব দ্বারা রূপে ও রসে তাঁর কবিতাকে গড়ে তোলেন। প্রথমত দৈনন্দিন সংগ্রামময় দ্বন্দ্বমুখর জীবনের ভাবনা, দ্বিতীয়টি হলো যুগাতিক্রান্ত চিরন্তন এক ভাবনা। বলে রাখা ভালো যে একালের কবিকুল চিরন্তনের ভাবনা ভাবতে নারাজ। কারণ কালিদাস কিংবা রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভাবতেন, ক্রান্তদর্শিতার দ্বারা কয়েকশো বছর পরের সমাজ-সংসার জাগতিক জীবন মানবিক অনুভূতি, সেকালের রংবাহার কেমন হবে বা হতে পারে এ বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না এই সমস্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবিদল আমাদের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে কথা লিখে গেছেন তা কিন্তু এঁটো পাতার মতো কিংবা পড়ে ফেলা দৈনিক খবরের কাগজের মতো জঞ্জালের স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিতে আমরা পারিনি।

অন্যদিকে একালের যে সমস্ত কবিরা কলম হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁরা যুগের দাবি মেটাতেই বোধহয় বদ্ধপরিকর। হয়তো তাঁদের সপক্ষে যুক্তি রয়েছে। সেই যুক্তি হলো মূল্যবোধের পরিবর্তন। যে চিরন্তন মানবিক অনুভূতিগুলিকে অবলম্বন করে মানবসমাজ কালান্তরে এগিয়ে চলে, সেই মানবিক অনুভূতি বা মূল্যবোধকে ধরে নেওয়া হতো অপরিবর্তিত অবিনশ্বর। আকাশের সূর্য যতদিন দীপ্যমান থাকবে, বাতাস থাকবে বহমান, চাঁদের আলোতে দেখা যাবে স্নিগ্ধতা, ততদিন পর্যন্ত এই মানবিক মূল্যবোধগুলি মানুষ নামক প্রাণীর হৃদয়-মস্তিষ্কে রয়ে যাবে বলে কবি সমাজ মনে করতেন। কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি — যে কোনো মানবিক অনুভূতি কিংবা মূল্যবোধ চিরন্তন হতে পারে না। সাগরবক্ষে জেগে ওঠা একটি ঢেউ যেমন কখনো চিরন্তনত্বের তিলক কপালে পরতে পারে না, সকালের ফুটে ওঠা ফুল যেমন বিকেলেও সতেজ সরস মধুময় থাকার দাবি করতে পারে না অনুরূপভাবে সকালের মূল্যবোধগুলি আজকের দিনে অপরিবর্তিত থাকছে না। অর্থাৎ একটা চোরাবালির স্রোত এবং দোলাচল মনোবৃত্তি আমাদের প্রতিমুহূর্তে তাড়িত, নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। হয়তো এর পিছনে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিশ্বায়নের মানসিকতা, বিশ্বভাবনা, সমগ্র বিশ্বকে হাতের মাউসের মধ্যে পাওয়ার যে সুযোগ, তার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি কারণে এই পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মূল কথা হলো — কবিরা যে মানবিক অনুভূতি অবলম্বন করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবিতা রচনা করেন সেই মানবিক অনুভূতিগুলি যদি চিরস্থায়ী না হয় তাহলে কবিতার ভাব ভাবনা কবির দর্শন কখনোই অনন্তকালের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে না। ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হলো — সকালে যে কবিতা প্রাসঙ্গিক ছিল বিকেলে সেই কবিতা হয়ে গেল অপ্রাসঙ্গিক। যে কবিতাটি আজ প্রেমিকাকে প্রেম নিবেদন করার সময় সকালের আধুনিক প্রেমিক উচ্চারণ করছে, আগামীকাল সকালে পৃথিবীর প্রেক্ষাপট অনুরূপ থাকছে না বলেই কিংবা প্রেমিক এবং প্রেমিকার প্রেমময়তারও বিবর্তন সাধিত হচ্ছে বলেই আগামীকালের প্রেমিক আজকের কবিতাটি উচ্চারণ করে আর প্রেম নিবেদন করছে না। তার জন্য আগামীকালের উপযোগী কবিতা লিখতে হচ্ছে বা হবে। ক্রমপরিবর্তনশীল এই জগৎ আমাদের চিরস্থায়ী ভাবনায় থাকতে দিচ্ছে না। কবিরা প্রতিমুহূর্তে কবিতা লিখে চলেছেন; সেই কবিতাকে জনমানসে পরিচিত করে তোলার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুক-মেসেঞ্জার চ্যাট প্রভৃতি ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার করছেন। কারণ যদি তিনি এই অপেক্ষায় বসে থাকেন যে ছাপা ও লেখার অক্ষরে দুই মলাটের মধ্যে বন্দী হয়ে তাঁর কবিতা পাঠকের দরবারে গিয়ে হাজির হবে, তাহলে দেখা যাবে তার মাঝে গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়ে গেছে, বয়ে গেছে সময়। যে সময়কে অবলম্বন করে তিনি কাব্যকুসুম ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেই সময়টি আজ আর নেই। ফলে সেই কবিতাকুসুমের গন্ধ-বর্ণ-আকর্ষণ হারিয়ে অকালের একটি ঝরা পাতার মতো স্বপ্ন ভঙ্গের অবস্থা হবে। নদীর চলমান স্রোতে একবার ডুব দেওয়ার মতো কবিতাটি পাঠকের কাছে আর কোনো আবেদন জাগাতে সক্ষম হবে না। বাস্তবকে মেনে নিতে গিয়ে কবিকুল বাধ্য হচ্ছেন প্রতিদিনের উপযুক্ত কবিতা লিখতে। হয়তো যুগান্তকারী সৃষ্টি থেকে, চিরকালের সামগ্রী থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। এই বিচ্ছিন্নতার প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তি সবই মহাকাল বিচার করবে। কিন্তু যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে যে কবিতা অনেকখানি সংবাদপত্রের খবর এবং কবিও অনেকাংশে সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তা সচেতন পাঠক উপলব্ধি করতে পারছেন। ফলে একালের কবিতার পরিণামও দাঁড়িয়েছে সংবাদপত্রের মতো ক্ষণস্থায়ী। হয়তো এটাই একালের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যধারা।

একালের কবিতা অনেকখানি আত্মমুখী, শুধুমাত্র কবির জন্যই কবিতা লেখা। যিনি কবিতা লিখছেন তিনি পাঠকের উপরে এমন একটি ভাব আরোপ করছেন, যদি পাঠক সেই ভাবের উপযুক্ত মননশীল হতে না পারেন তাহলে তিনি সেই কবিতার রস গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ''আমি কবি যত কামারের কুমোরের ছুতোরের মেথরের'' এই ভাবনা থেকে একালের কবিতা অনেকদিন আগেই সরে এসেছেন। আধুনিক কবিতা আড়ালে আবডালে প্রকারান্তরে পাঠককে জানিয়ে দিচ্ছে যে পাঠক যদি উপযুক্ত শিক্ষায় চেতনায় মননশীলতায় বাস্তব প্রেক্ষাপট সচেতনতায় উন্নত হয়ে না উঠতে পারেন, তাহলে আজকের বাংলা কবিতার দরজা তার জন্য অবরুদ্ধ। কারণ বাঙালি কবিরা এখন সচেতনভাবে পাশ্চাত্য ভাষা এবং সংস্কৃতির নিবিষ্ট অনুকরণ করছেন, পাশ্চাত্য ভাব-ভাবনা-পারিপার্শ্বিকতা ব্যবহার করছেন। ফলে যে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি কবিতা লিখছেন সেই প্রেক্ষাপট শুধুমাত্র বাঙালি-বিহার-ওড়িয়া-তামিল-পাঞ্জাবি কিংবা আরো একটু ব্যাপ্তভাবে বললে ভারতীয়দের জন্য নয় সেই প্রেক্ষাপট সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য। আজ তাই বাংলা কবিতার ভাব-ভাবনা সমগ্র

বিশ্বের সঙ্গে এক। শুধু ভাষা আলাদা। হয়তো সমকালীন একই ভাব নিয়ে আমেরিকার মাটিতে ইংরেজি ভাষায় একটি কবিতা লেখা হলো। অনুরূপ ভাবনাতে কলকাতার কোনো একজন কবি বাংলায় একটি কবিতা লিখলেন। যদি পাঠক এই বৃহৎ পৃথিবীর সুলুকসন্ধান সম্বন্ধে অবহিত না হন, তাহলে তাঁর কাছে কখনোই কবিতাটি মর্মগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারবে না। ফলস্বরূপ আজকের বাংলা কবিতা সকল পাঠকের জন্য নয় — কোনো কোনো পাঠকের জন্য।

খুব মজার ব্যাপার এই যে কুক্ষিগত ভাবনা বা কবিতার ভাবনার এই সংকীর্ণ সত্তা কিন্তু আমরা কয়েক দশক আগে লক্ষ্য করিনি। বাংলা কবিতা দীর্ঘকাল পাশ্চাত্য কবিতার দ্বারা প্রভাবিত রসায়িত হয়েছে, সে কল্লোলের যুগেই হোক বা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসের কবিগোষ্ঠীর সময়েই হোক কিংবা একালের দেশ পত্রিকার কবিদের দ্বারাই হোক। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত বাঙালির জন্য বাংলার জন্য কবিতা যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কবিতায় পাশ্চাত্য ভাবনা ছিল না এমনটা নয়। কিন্তু তাঁরা বাঙালিয়ানাকে ভুলে যাননি। কোন্ পাঠকদের জন্য কবিতা লিখছেন, কোন্ বিষয়ে লিখছেন — এই জ্ঞান তাঁরা রাখতেন। তাই পাঠকের মননশীলতার সঙ্গে কবিতার বিষয়ের একটা সাযুজ্য তৎকালীন দিনে রাখার চেষ্টা করা হতো। আজকের দিনে এই সাযুজ্য রাখার কোনো প্রয়াস বোধহয় কবি সমাজ আর করেন না। ফলে কবিতার পাঠকের সংখ্যা আমাদের মনে হয় ক্রমাগত কমছে। সেদিন ছিল সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি, আজ সকলেই কবি। কিন্তু আজ আমার কবিতার মর্মার্থ আমি করতে পারব — অন্য জন নয়। এ যেন এমন এক সাংকেতিক দুর্বোধ্য উর্ণনাভ যার মধ্যে আমরা ঢুকতে পারি না শুধু বাইরে থেকে তাকিয়ে থাকি। একথা অনৃতভাষণ হবে না যে সবকালেই হাতেগোনা কয়েকজন কবি থাকেন যাঁরা বর্তমান দেশ-কাল-পাত্রের সীমাকে অতিক্রম করে চিরন্তন ভাবনার জাল কবিতায় বুনতে চান, হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সঙ্গে একালের মেলবন্ধন ঘটাতে চান। সেই সমস্ত কবিদের কবিতার জন্যই আমরা হয়তো ফেলে আসা জগৎটাকে, তার আলোছায়াকে আবার ফিরে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পাই। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ ও জয় গোস্বামীর নাম আমাদের স্মরণে আসবে। এঁরা সমকালের কোলাহল ও হলাহলের মাঝে চিরকালের কথাটি বিস্মৃত হন নি। যুগের দাবিতে কিছু কবিতা হঠাৎ লিখলেও শাশ্বত সুর ও স্বর থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন নি। ফলে নিজেদের কালের প্রতিভূ হিসেবে থেকে গেছেন।

২

সমসাময়িক কালকে কবিরা যে উপেক্ষা করতে পারেন না তার প্রমাণ পাচ্ছি ১৪২৮-এ প্রকাশিত কয়েকটি কবিতায়। কৃষ্ণা বসু 'জীবন-নদ বইছে, দ্যাখো'[১] কবিতায় লিখেছেন —

বন্দী আছি, বিশ্রী আছি, আর কতদিন থাকব?
বন্দিজীবন পার হয়েছে আর কতদিন বাঁচব?
এই অসহায় জীবন-যাপন, এই অসহায় ফন্দি,
ঘরের মধ্যে আর কতদিন রইব বলো বন্দি?
বন্দিজীবন ভাল্ লাগেনা, মুক্ত জীবন চাই,
বন্দি রবো চার দেওয়ালে? দারুন যাচ্ছেতাই!

বলার অপেক্ষা রাখে না কবিতাটি করোনাকালে কোয়ারেন্টাইনে থাকা বন্দী জীবনের প্রসঙ্গে লেখা জীবনের সঙ্গে নদীকে মিলিয়ে দিয়ে নদীর মতোই কবিমন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। চেয়েছে সময়ের স্রোতে অবগাহন করতে। কবিতায় সাবলীল উপস্থাপনা পাঠককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু সময় অন্তরে এই কবিতার আবেদন প্রশমিত হতে বাধ্য। কারণ কোনো একটি বিশেষ সময়ের জন্যই কবিতাটি লেখা।

আবার সেমন্তী ঘোষ 'অতিমারির দিনে'[২] কবিতায় লিখেছেন —

স্তব্ধ দুপুরে, আম, মিষ্টি, কলা, বেদানার ঠেলা হয়ে,
পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি সেরে জিরোই কোনা-ঘুঁজি,
দরদামে অনন্ত ক্রেতা আমি, সঞ্চয়ে মায়াহীন,
শরীর রক্ষার ছলে রসনায় ধার দিই তুড়ি মেরে পৃথিবী।

সন্ধ্যার ব্যায়াম, গুষ্টির স্বাস্থ্য উদ্রেক করে সিনা টান!
কে মরে, বা বাঁচে, চলন্ত ছবির মতো বোধ ও বিকারহীন,
বদলেছি কাদা যেন, মনুষ্য জন্ম থেকে যন্ত্রমানবের,
আমিই ছিলাম সব, আমিই মরেছি সজ্ঞানে, জীবদ্দশায়।

এখানেও করোনা মহামারী আসার আগে প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামে কবি যেভাবে যুক্ত থাকতেন সেই জীবনসংগ্রাম বন্দিদশায় আর নেই জেনে তিনি পুনরায় ফেলে আসা জীবনে ফিরে যেতে চান। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি কবিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কবিতাটি সময়ের কথাচিত্র মাত্র।

চিত্রকল্পময়তার ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের অপূর্ব নিদর্শন বিকাশ সরকারের লেখা 'কাকা, এখানে বসেন'[৩] কবিতাটি। কবিতাটি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে —

এই শহর খুব ভুতুড়ে আর ভালবাসাহীন
এই শহর আমার একাকীত্ব দেখে চোখ কুঁচকে তাকায়, যেন আমি এক অস্থিচর্মসার প্রেত...

লোকাল ট্রেনগুলো অন্ধকার ফুঁড়ে আসে আর যায়
আমি লেভেল ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে একা একা দেখি মৃত সব যাত্রীদের
বসে থাকা, ঝুলে থাকা, একে অপরকে লেপ্টে জড়িয়ে থাকা মৃতদেহ সব
আমিও আমার মৃতদেহটি দেখতে পাই
জানালার পাশে বসে আছে বুকে নোংরা ব্যাগ চেপে
মলের পাশে ঘিঞ্জিতে ভাঙ্গা বেঞ্চে বসে আমার মৃতদেহটি ভাঁড়ের চা পান করে
আর রাস্তার কুকুরগুলির লকলকে জিভ তাকে চেটে চলে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সে উঠে যায়

আমার মৃতদেহটিও তাই বেওয়ারিশ, অচেনা অজ্ঞাতকুলশীলের মতো সে হাঁটে
এত যে ভিড় এই শহরে কেউ তার দিকে ফিরেও দেখে না

এই যে কত সুবেশ তরুণ-তরুণী ছুটছে ঝলমলে সব রেস্তোরাঁর দিকে
এই যে কত প্রেমিক তার প্রেমিকাকে সঙ্গ দিচ্ছে খুনসুটি করে
এই যে কত বাবুদের দল, কত দালাল, খাজাঞ্চি, ঝানু মোসাহেব

আমার মৃতদেহের দিকে কেউ ফিরেও দেখে না

শুধু লোকাল ট্রেনের নোংরা বেঞ্চে একটি মৃতদেহ সরে গিয়ে বলে 'কাকা, এখানে বসেন'

কবিতাটিতে কবি কোন যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন নি যদিও অনেক জায়গাতেই ভাব সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ণ ভাবে থেমেছে ভাবের গতি। একালের কবিতায় ভাব উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যতিচিহ্নকে কবিরা নানা ইঙ্গিতে ব্যবহার করছেন। যতিচিহ্নগুলি যেন আগের চেয়ে একালে অনেক বেশি বাঙ্ময়। ট্রেনের ছুটে চলা, চলমান জীবন এবং তারই মাঝে আমার মৃতদেহ এই চলমানতাকে কবি হয়তো পূর্ণ যতির ব্যবহারে থামিয়ে দিতে চাননি। এ কারণেই আংশিক বিরতি হিসেবে কমার ব্যবহার থাকলেও কোনো পূর্ণচ্ছেদ কবিতাটিতে নেই। কবিতাটি ইঙ্গিতবাহী।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ আজ একা। একাকীত্বের কারণেই সে তার নিজের হিসেব অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছে না। হয়তো অন্যরাও হিসেব মেলানোর জন্য উদগ্রীব নয়। অন্যের সঙ্গে জীবনের হিসেব, গতি মেলানোয় তাদের নেই কোনো দায় কিংবা দায়িত্ব। একাল তার নিজের গতিতে রেস্তোরাঁ প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের খুনসুটি, দালালি, মোসাহেবি এদেরকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলছে। এরই মাঝে আমি আমরা একলা। একাকীত্ব অনুভব করছি। সবার সঙ্গে সব সময় নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারছি না। স্রোতে অবগাহন করার ক্ষমতা সবার থাকে না। কারণ সবার জীবনস্রোত সমান নয়। এটাও সত্য যে সকলের জীবনের স্রোত আমার মনের মতো হবে এটা আশা করা মূর্খামি। কবি একাকিত্বের বেদনাকে যেমন রূপায়িত করেছেন তেমনই চলমান সমাজ-সংসারের নিটোল চিত্রকে এঁকেছেন কথার তুলিতে।

একবিংশ শতাব্দী তৃতীয় দশকের বাংলা কবিতায় প্রেম কিরূপে উপস্থিত হয়েছে তা একটু দেখা প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি যে প্রেমানুভূতির রূপান্তর ঘটেছে কালে কালান্তরে। একশো বছর আগে প্রেম নর-নারীকে যে ভাবে আলোড়িত করত, যতখানি দায়বদ্ধতা সে প্রত্যেকের কাছ থেকে আদায় করে নিত, ত্যাগ এবং তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠত, তাকে আমরা তেমন ভাবে আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছি না। রাতের অন্ধকারে যেমন সূর্যের উদয় হয় না, দিনের আলোতে যেমন আকাশের তারাদের দেখা পাওয়া যায় না; প্রেমানুভূতিও কালে কালান্তরে বদলাবে সামাজিক পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এটাই স্বাভাবিক। শুধু প্রেম নয় সমস্ত মানবিক অনুভূতিগুলির পরিবর্তন এই একই ধারায়। কবিরাও একালের প্রেমকে একালের মত করে তাঁদের কবিতায় হাজির করছেন। সেখানে মানসসুন্দরী নেই, সোনারতরী চেপে সুদূরের অভিসারে যাত্রা নেই, কিংবা সত্তর বা আশির দশকে যে প্রেমকে দেখেছিলাম কামনা-বাসনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে সেই রূপও এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের প্রেম শুধু কামনা বা রক্ত মাংসের গন্ধ নয়; অবিশ্বাস অসুস্থ প্রতিযোগিতা প্রতি হিংসা কদর্যতা এবং পারস্পরিক হানাহানিতে ভরা। এখানে যৌন আবেদনের চেয়েও অর্থ প্রাচুর্যে সম্পদে জীবনকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার আবেদন অনেক বেশি জীবন্ত, সজীব। কাছে আসা, দূরে সরে যাওয়া সবই যেন আপেক্ষিক। কোথাও কোনো মায়ার বন্ধন নেই, কোনো প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতা নেই, নেই বিচ্ছেদের বেদনা। কারণ আজকের প্রেমিক প্রেমিকার হাতে হাত রাখছে একথা ভেবে যে সে হাত একদিন ছেড়ে যাবেই। এই ক্ষণবাদ আধুনিক কবিতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা সুবোধ সরকারের 'তাহলে ভালোবাসলাম কেন' কবিতায় দেখি কবির কাছে প্রেম একটা বিদ্রোহের প্রতীক। কবি তাঁর প্রেমকে স্থায়িত্ব দান করার জন্য যে কোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। এমনকি প্রেমিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে যে ছেলেটি হঠাৎ ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়েছিল তার গালে একটা চড় এবং হাতে একটা চকোলেট দুটোই দিতে একালের প্রেমিকা তৈরি রয়েছে। আবার এটাও সত্য যে আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আজকের যে প্রেমিক প্রেমিকাকে চুম্বন করতে চাইছে, ভালোবাসতে চাইছে, সেই প্রেমিক জানে এই প্রেমিকাকে হয়তো এ জীবনে গৃহিণী হিসেবে পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। এই পরিস্থিতিতে প্রেমের সব ফুল ফলে পরিণত হবে না। হলদে সুতোর বন্ধনে প্রেম

পরিণতি পাবে না। প্রেম এসেছে বন্যার জলের মতো। কিছুক্ষণ সময়ের পরে তাদের জীবন থেকে আবার চলেও যাবে — একথা প্রেমিক কিন্তু ভোলেনি।

রনজিৎ দাশ 'চুম্বনের প্রতিশ্রুতি'[৪] কবিতায় লিখেছেন — "একটি চুম্বনে যদি অস্তিত্বের সমস্ত লুপ্ত না হয়, তাহলে সে চুম্বন বৃথা!" প্রেমিকা তার কাছে বনলতা সেন। শুধুই ব্যাকুলতা বৃষ্টি আর অভিসার। এতসবের পরেও প্রেমের কাছে প্রেমিকের প্রত্যাশা বৃথা এবং তার একসঙ্গে মৃত্যু। অর্থাৎ প্রেম মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষণবাদী, হননকারী চিন্তা একালের আধুনিক কবিতাকে অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে আমাদের ধারণা।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'নির্বাচিত প্রেমের কবিতা আর পরেরটা'[৫] —

হ্যাঁ, অন্তবিহীন তর্ক তোমার-আমার।
কাটা ছেঁড়া করার টেবিলে আলো জ্বলে, নেভে। আর
আমি নীল বাড়িটির কথা তুললে তুমি বলো, পৃথিবী কালো রঙে ভরে গেছে...
আমি কৃষ্ণসার হরিণের গল্প করতে গেলে
তুমি বলো, জোর দিয়ে বলো, কী ভাবে মাংস তার শত্রু হয়ে আছে!
তোমাকে সম্পর্কের মধ্যে টেনে এনে, আমার দু'হাত পাতি।

কবিতার শেষে প্রেমিকা প্রেমিকের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে দেখেছে সবই বিস্বাদ।

পৃথিবীর রং কালো হয়ে যাওয়া, হরিণের শরীরের মধ্যে শুধুমাত্র মাংসটুকু খুঁজে পাওয়া, কিংবা চুম্বনের সময় ঠোঁটের মধ্যে কোনো সংবাদ ও উষ্ণতা খুঁজে না পাওয়ার ছবি এই যুগের প্রাপ্তি। 'সর্বনাম'[৬] কবিতায় কবি সোহরাব পাশার কাছে ভালোবাসা হয়ে উঠেছে "নিদ্রিত পুরনো অ্যালবাম।" শেষ দু' বছরে করোনা নামক যে মহামারী আমাদের জীবনে ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই মহামারী আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। বিপর্যস্ত অর্থনীতির ফলস্বরূপ এই ক্ষয়িত শ্রীহীন জীবনের রূপ আমরা কবিতায় লক্ষ্য করছি।

জীবনখাতার অনেকগুলো পাতা সারা জীবন ধরে উল্টেপাল্টেও জীবনের অনেক গল্প অপঠিত থেকে গেছে কবি তৈমুর খানের 'পাণ্ডুলিপি অন্ধকার'[৭] কবিতায়। কবিতাটিতে একালের জীবনের রূপ এরকম —

ধূসর বাগানে পাতা ঝরে গেছে
বাসায় ফিরেছে সব পাখি!
স্মৃতির পাখিরা সব রাঙা ঠোঁটে কেউ কেউ ডাকে

টেবিলে চশমাটি রেখেছি খুলে
পানপাত্র খালি পড়ে আছে
ঝাপসা অক্ষরগুলি পৃষ্ঠা জুড়ে কিলবিল করে।

বাংলা কবিতার শরীর থেকে ছন্দ অলংকার অন্তমিল কিংবা কবিতার যে প্রথাগত রূপ আমরা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম তা অনেক আগেই মুছে গেছে। একালের আধুনিক কবিতা কবিরা কবিতাকে উপস্থাপন করতে চাইছেন গদ্যের স্টাইলে। অথচ সেই গদ্যময়তার মধ্যেও একটা কবিতার স্বচ্ছ প্রবাহ আমরা উপলব্ধি করি। আসলে প্রকরণগত দিক দিয়ে কবিতাকে নিয়ে নানা গবেষণা ভাঙা-গড়া বাংলা সাহিত্যে

হয়েছে হচ্ছে এবং চলতে থাকবে গদ্যের মতো। প্রবন্ধের আকারে একালে কবিতা লেখার স্টাইল কবিদের মনে উঁকি দিচ্ছে। সেই স্টাইল পাঠককে কতখানি কবিতাপাঠে আগ্রহী করে তোলে সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। আমরা হিন্দোল ভট্টাচার্যর 'লোক'[৮], অগ্নি রায়ের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'[৯], সুদীপ চক্রবর্তীর 'কীভাবে জোনাকি হয় মানুষ'[১০] কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব। 'লোক' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন মানুষের জন্ম একবার হলেও সে বারে বারে জন্মগ্রহণ করে তার সৃষ্টির মধ্যে এবং কবিতা গান গল্পে নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সময় সে তার মায়ের মতোই প্রসব বেদনা অনুভব করে। এই প্রসব বেদনা নিয়েই একজন কবির বেঁচে থাকা। হয়তো তাকে গন্ধর্ব সভায় কেউ কখনো ডাক দেয় নি। যে শব্দ বা অক্ষর পোয়াতির শরীরের মতো তাকে বারবার আকর্ষণ করত, সেই আকর্ষণের মূল্য কেউ দেয়নি। তা সত্ত্বেও সে জন্মলাভ করতে চায়। একই জন্মে বহুবার বহুরূপে। কবিতাটি চারটি পঙ্‌ক্তিতে লেখা এবং ছোটগল্পের স্টাইলে। অগ্নি রায়ের কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রেক্ষাপটের দিক দিয়ে হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক। তিনি কলকাতার পাইকপাড়ার সরু গলিতে দাঁড়িয়ে আমেরিকার কোনো আলোকোজ্জ্বল নগরীর কথা ভাবতে থাকেন। কখনো বা পাশ্চাত্যের ভাবনাকে হাজির করেন আমাদের এঁদো গলির কালো জলের পুকুরের পাড়ে। তাই তাঁর কবিতা 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' আমাদের কাছে এক বিচিত্র স্বাদ এনে হাজির করে। কবিতার শুরুতে কবি আমাদের প্রতিদিনের চাওয়া-পাওয়ার কথা বলেছেন। বেশির ভাগই না-পাওয়ার তালিকা। আমরা অনেক না-পাওয়ার মাঝেও কখনো কখনো ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির স্বর্গে গিয়ে হাজির হই যদিও এই সুখ-শান্তির স্বর্গে আমাদের স্থায়িত্ব আপেক্ষিক। তবু আমরা তাকে স্পর্শ করতে চাই, চাই কিছুক্ষণের জন্য সেই পাহাড়ের চূড়ায় থাকতে। কবিতার শেষ অনুচ্ছেদে কবি লিখেছেন —

উদাসিনী বেশে যে বিদেশিনী ক্যাসিনো-কন্দরে, তাকে ডিঙিয়ে উঠেছিল টেকিলা স্বচ্ছ চাঁদ। সেই ম্রিয়মাণ আলোর নিচে মেরুন
লিপস্টিক দিয়ে টিস্যু পেপারে যিনি রোজ আঁকতেন হারিয়ে যাওয়া এক শহরের ছবি। গির্জাতলার নির্জনে সেই বাসনাবিলাসের
সিলমোহর পড়ত। পশ্চিমের হাওয়া যা ফের মুছে দিত, রাত হেরে গেলে

কবিতার গঠন-ভঙ্গিমা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনটি অনুচ্ছেদে কবিতাটি লেখা। প্রতি অনুচ্ছেদে তিনটি করে লাইন। প্রত্যেকটি লাইনে অন্তত ষোলো-সতেরটি করে শব্দ এবং একটি পঙ্‌ক্তি তৈরি হয়েছে গোটা কয়েক বাক্যকে সঙ্গে নিয়ে। কবিতার অন্দরে অনেকগুলো পূর্ণ যতি থাকলেও কবিতার শেষে কোনো পূর্ণ যতি নেই। কবিতার নাম নির্বাচন পাঠককে অবশ্যই ভাবিত করে তোলে।

'কীভাবে জোনাকি মানুষ হয়' কবিতাটি সাড়ে ছয়টি লাইনে লেখা। প্রত্যেকটি লাইন অত্যধিক দীর্ঘ। কুড়ি থেকে বাইশটি শব্দে একটি লাইন গড়ে উঠেছে। আটটি পূর্ণ যতির ব্যবহারে কবি কবিতাটিকে গড়ে তুলেছেন। কবিতার গঠন ভঙ্গিমা অবশ্যই অভিনব। কবিতাটিতে আরো পাঁচজন কবির মতো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা বললেও কবি শেষ পঙ্‌ক্তিতে চিরন্তন সত্য উদঘাটিত করেছেন। আমরা এখনকার দিনে যা করে চলেছি, যা প্রশ্নহীন ভাবে হতে দেখছি; বাড়িতে বউ থাকতেও পরকীয়া, ভাইকে ফাঁকি দিয়ে পুরো সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া — এ সবের মাঝেও আমাদের জীবনে মৃত্যু এসে হাজির হয়। রক্তমাংসের শরীর আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। কবি দেখেছেন শুধু মানুষের শরীর চিতার আগুনে দগ্ধ হয় তা নয় —

আর এই পবিত্র প্রেতভূমে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি — মানুষ পোড়ে না। কেবল তার আকাঙ্ক্ষাগুলো ধোঁয়া হয়ে আকাশে মেঘ হয়ে যায়।

ছোটগল্পের মতো করে আরেকটি কবিতা লিখেছেন অরুণাভ রাহারায়। রূপ গঠনে আমরা দেখছি যে বাংলা কবিরা বারেবারে কবিতার প্রথাগত গঠন ভঙ্গিমাকে পরিবর্তন করতে চাইছেন। তবে বাংলা কবিতা কোনোকালে একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমে আটকে ছিল না। সময় যত এগিয়েছে ততই কবিতার পরিকাঠামোগত গবেষণার ইচ্ছা প্রতিনিয়ত কবিমনকে আকৃষ্ট করেছে।

ছন্দের বন্ধন একালের সকল কবি কবিতা লেখার কালে উপেক্ষা করতে চাইছেন এমনটা নয়। অনেকেই ভাবছেন ছন্দ ভাবনার প্রকাশে বাধাস্বরূপ। তাই ছন্দের পাহাড়কে সরিয়ে দিয়ে খোলামেলা এক প্রান্তরে ভাবকে তাঁরা মুক্তি দিতে চান। অন্যদিকে কোনো কোনো কবি ছন্দের বন্ধনকে মেনে নিয়েই ভাবের বিস্তার ঘটান। মৃত্যুকাল পর্যন্ত শঙ্খ ঘোষ ছন্দকে অবজ্ঞা করেননি । তবে তাঁর কোনো কোনো কবিতায় আমরা ছন্দকে বাইরে নয় অন্তরে প্রবাহিত হতে দেখেছি। তা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী, শ্রীজাত ছান্দসিক কবি। ঠিক সেরকম ভাবেই আমরা একালের যে পত্র-পত্রিকা পড়ে থাকি তাতেও আধুনিক কবিদের হাতে ছন্দময় কবিতা উপহার হিসেবে পাই। যেমন 'নোঙরের গান'[১১] কবিতায় কবি অভিজিৎ রায় লিখেছেন —

পরিচিত পাখি দেয় শিস
জানালায় বন্দরের গান;
আংটিতে জমে আছে বিষ,
মনে জমে আছে অভিমান।
অবসাদ পাইনের গাছ,
পথে পথে বরফের মেঘ;
ভ্রমণের জলে পোষা মাছ
চিনে নেয় পথের আবেগ।

আমরা দেখছি কবি ছন্দের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন ভাবকে নিয়ে। যতিচিহ্ন ব্যবহারেও একটা ছন্দময়তা রয়েছে।

আবার বিতান ঘোষ তাঁর 'কি যেন হই!'[১২] কবিতায় ছটি অনুচ্ছেদে কবিতাটি লিখে তার একটি অনুচ্ছেদ ছন্দময় এবং পরের অনুচ্ছেদটিকে ছন্দহীন ভাবে গড়ে তুলেছেন। আবার যে অনুচ্ছেদ ছন্দহীন সেই অনুচ্ছেদের শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিল বজায় রেখেছেন। ফলে গোটা কবিতার গঠন ভঙ্গিমায় ছন্দ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। কবিতাটি এরকম —

জোনাকিদের ডানায় যেমন আগুন ছিল
আগুন ছিল লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে
চৈত্র রাতের আকাশজুড়ে শতেক তারার গল্প ছিল গল্প কিছু বোনাও হতো কথার জালে আখর ধরে
সেই গল্প জমিয়ে রেখে, তোমায় দিলাম একখানি বই আমরা দুজন পরস্পরের কি যেন হই!
আঁধার ছিল গহিন কাজল চোখের মায়ায়
মেঘলা দিনে আঁধার যেমন অল্প ছিল
আঁধার ছিল কাস্তে চাঁদের চন্দ্রমাতে
মনকেমনের আঁধার মুখে গল্প ছিল
সেই গল্প দুই মলাটে বন্দি করে, তোমায় দিলাম একখানি বই
আমরা দুজন পরস্পরের কি যেন হই?

একথা সত্য যে ক্রিয়াপদ সহযোগে অন্ত্যমিল কখনোই একজন কবির ছন্দ গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় হতে পারে না। তা সত্ত্বেও একালের কবিরা ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষ্য, বিশেষণ সব পদকে কাজে লাগিয়েই অন্ত্যমিল রচনা করছেন। আলোচ্য কবিতাতে 'ছিল' এই ক্রিয়াপদটি বারেবারে ব্যবহৃত হয়েছে কবিতার ভাবনা প্রকাশের জন্য এবং অন্ত্যমিলকে যথাযথ রাখার জন্য। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো কবিতার ছন্দহীন অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে 'ছিল' এই ক্রিয়াপদের মাধ্যমে অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে এবং কবিতাটি যে

দুর্বোধ্য নয় তা সচেতন পাঠক উপলব্ধি করতে পারেন। এখান থেকে আমরা জানতে পারছি যে আধুনিক কাল কখনোই সকল কবিকে একই সমান্তরাল রেখায় এনে দাঁড় করিয়েছে এমনটা নয়। কোনো কোনো কবি বড় ভাবনাকে সহজ ভাষায় আজীবন প্রকাশ করে গেছেন। আবার কোনো কোনো কবি দুর্বোধ্য ভাষাকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন ভাবের বাহন হিসেবে। অর্থাৎ ভাব এবং ভাষার এই সামঞ্জস্য-বিধান কবির রুচিসাপেক্ষ।

৩

একালের কবিতার গতিপ্রকৃতিকে বিশেষভাবে চেনার জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হবে জয় গোস্বামীর লেখা 'নিজের বিরুদ্ধে'[১৩] এবং 'ভগবান সব শোক ভুলিয়ে দেন'[১৪] কবিতা দুটির দিকে। কবিতা দুটি লেখা হয়েছে আমাদের প্রতিদিনের সংবাদপত্রের শিরোনাম কেশপুর-গড়বেতা-নেতাই-নানুর-নন্দীগ্রাম-বগটুই-কঙ্কাল-ধর্ষণ-জ্যান্ত আগুনে পোড়ানো সেই ঘটনাগুলোকে অবলম্বন করে। হয়তো এই কবিতায় কবি ভাবের চিরন্তনত্ব দাবি করতে পারেন না। কারণ 'ভগবান সব শোক ভুলিয়ে দেন' কবিতার শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে কবি লিখেছেন —

সময়, ভাই সময়
সে এক আজব জিনিস
সে-নদী সব খায়
মনের ওপর পলি
ফেলতে ফেলতে চলে...
বগটুই গ্রামের
আগুন ভুলে যাব
সবাই, আমরা সবাই
কেবল কবিতায়
শোয়ানো থাকবে
সাদা কাপড় ঢাকা
আটটি মৃতদেহ।

শুধু কি বগটুইকে ভুলে যাব? আমরা কি জয় গোস্বামীর এই কবিতাটিও কেউ ভুলে যাবো না? কারণ এর আগে জয় গোস্বামী নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর বিষয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। আমরা কি সে সব কবিতাকে মনে রেখেছি? যেমন মনে রেখেছি তাঁর সুপরিচিত বহুপাঠ্য হৃদয়ে দোলা দেওয়া অনেক কবিতাকে! আসলে সংবাদপত্র খবর চায়। কবিতাও যদি খবরের সন্ধানী হয়ে ওঠে তাহলে তখন কবিতা আর কবিতা থাকে না; যতই কেননা একজন সামাজিক সচেতন মানুষ হিসেবে কবি সমাজের অনিয়ম-বিশৃঙ্খলার প্রতিবাদ করুন। কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে — কবিতা কখনোই প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ছন্দময় সংবাদে পরিণত হতে পারে না। কবিতা কবিতার জন্য। যে সাহিত্য আমাদের আনন্দ দেয় না সেই সাহিত্য কখনোই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। একথা একালের কবিদের বিস্মৃত হওয়া হয়তো উচিত হবে না।

তথ্য উৎস:

১। ‘জীবন নদ বইছে, দ্যাখো’, কৃষ্ণা বসু, আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদক ঈশানী দত্তরায়, শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৮, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১, পৃষ্ঠা ২৮১।

২। ‘অতিমারির দিনে’, সেমন্তী ঘোষ, ওই, পৃষ্ঠা ২৮২।

৩। ‘কাকা, এখানে বসেন’, বিকাশ সরকার, ওই, পৃষ্ঠা ২৮৪।

৪। ‘চুম্বনের প্রতিশ্রুতি’, রনজিৎ দাশ, ওই, পৃষ্ঠা ২৮১।

৫। ‘নির্বাচিত প্রেমের কবিতা আর পরেরটা’, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, ওই, পৃষ্ঠা ২৮২।

৬। ‘সর্বনাম’, সোহরাব পাশা, ওই, পৃষ্ঠা ২৯৩।

৭। ‘পাণ্ডুলিপি অন্ধকার’, তৈমুর খান, ওই, পৃষ্ঠা ২৮৭।

৮। ‘লোক’, হিন্দোল ভট্টাচার্য, ওই, পৃষ্ঠা ২৮৭।

৯। ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’, অগ্নি রায়, ওই, পৃষ্ঠা ২৯৬।

১০। ‘কীভাবে জোনাকি হয় মানুষ’, সুদীপ চক্রবর্তী, ওই, পৃষ্ঠা ২৯৪।

১১। ‘নোঙরের গান’, অভিজিৎ রায়, ‘দেশ’ পাক্ষিক, সম্পাদক সুমন সেনগুপ্ত, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১, ১৭ মে ২০২২ কবিতায় কবি, পৃষ্ঠা ৪০।

১২। ‘কি যেন হই!’, বিতান ঘোষ, ওই, ১৭ মে ২০২২ কবিতায় কবি, পৃষ্ঠা ৪২।

১৩। ‘নিজের বিরুদ্ধে’, জয় গোস্বামী, ওই, ২ এপ্রিল ২০২২, পৃষ্ঠা ৬৮।

১৪। ‘ভগবান সব শোক ভুলিয়ে দেন’, জয় গোস্বামী, ওই, ২ এপ্রিল ২০২২, পৃষ্ঠা ৬৯।

লেখক পরিচিতি:

ড. সুব্রতকুমার পাল: প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড। অধ্যাপক পাল লিখিত গ্রন্থ — ‘বাংলা ও হিন্দী পৌরাণিক নাটক’, ‘বাংলা ও হিন্দী প্রহসন’, ‘বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে গ্রামজীবন’, ‘লিঙ্গবৈষম্য ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস’, ‘সাহিত্যের তত্ত্বতালাশ’, ‘বিচিত্ররূপে রবীন্দ্রনাথ’, ‘প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ’, ‘কালের বিবর্তনে দুই বাংলার উপন্যাস’ (সম্পাদিত)। এছাড়া তিনি নানা পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন।

—